শিক্ষা সমাজ দেশ

‘যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই...’

–ড. হাসনান আহমেদ

একটা গানের প্রথম কলিটা এরকম: ‘আগুনে যার ঘর পুড়েছে সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়’। লালন এ ধরণের ভয়কে গানে ‘ভয়তরাসে’ বলে প্রকাশ করেছেন। এদেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষেরও সেই একই দশায় ধরেছে। সাধারণ সমাজে আজন্ম চলাফেরা করি, তাই তাদের ভয়টা বুঝি। এ ভয়ের জন্য তাদের দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরাই কর্মের মাধ্যমে সে ভয় সৃষ্টি করেছি। একদিনে নয়, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ থেকে তাদের নাকের ডগায় উন্নয়নের ও বঞ্চনামুক্ত সমাজের মুলো ঝুলিয়ে রেখেছি; স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে।

এত ভয় কীসের? রাজনীতিকদের কৃতকর্মের ভয়। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি না। রাজনীতিকদের ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা-ভরসা রাখতে পারে না। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বুকভরা আশা নিয়ে মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে এদেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা উদ্দ্যেশের সঙ্গে সংবিধানে লেখা উদ্দেশের মিল ছিল না। ’৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সে আশা ক্রমশই ফিকে হতে হতে ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিল। অর্জিত স্বাধীন দেশে দুর্নীতির পাশাপাশি বাকশালী একদলীয় শাসন নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমতে থাকে। তখন থেকেই ভয় প্রগাঢ় হয়েছিল। সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ’৭৫-এর রক্তমাখা পটপরিবর্তন হয়। অনেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা ও পারস্পরিক দোষারোপ করলেও নিরেট বাস্তবতা হচ্ছে– মিষ্টির দোকানে আমরা সেদিন মিষ্টি ফুরিয়ে যেতে নিজ চোখে দেখেছিলাম। এ কথাটা আমি প্রায়ই লিখি, ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম’। এটা কামান-গুলি, খুন-গুম, নির্যাতন-কেসকাট্টা করে কেউ রোধ করতে পারে না। অতপর দেশে এলো সামরিক শাসন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তার শাসনের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তার গতিশীল নেতৃত্বে কোনো ‘চাটার দল’ তার গা ঘেঁষতে পারতো না। দেশের মানুষ তার দফাভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তার আত্মসচেতনতার কারণে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি তার কাছে পরাজিত হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্য তাকে দেশের অভ্যন্তরের ও বাইরের কুচক্রিমহলের ষড়যন্ত্রে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল। উন্নয়নের প্রক্রিয়া এতে হাতছাড়া হয়ে যায়। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানে দেশবাসী ভেবেছিল দেশটা মনে হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলা শুরু করলো। পর পর তিনটা নির্বাচন ভালো হওয়ায় পরাজিত দলের বিরূপ মন্তব্য বাদে, নির্বাচন নিয়ে দেশবাসীর মনের ভয় অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল, রাজনীতিতে ও প্রশাসনে ততদিনে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি ক্রমেই জেঁকে বসতে শুরু করেছিল। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হলো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, বিরোধীদল নিধন প্রক্রিয়া, খুন-গুম ও দুর্বৃত্তায়নের বাঁধভাঙা মচ্ছব। দিন যতই যেতে থাকলো বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষের জাঁকান্দানি (মৃত্যুকালীন অসহ্য যন্ত্রণা) বাড়তে থাকলো। নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগসহ সংবিধিবদ্ধ সব সংস্থার ওপর দলীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমেই দানবীয় রূপ ধারণ করলো। জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। এমনকি বিচারের রায় ক্ষমতাসীন দল লিখে দেওয়া শুরু হলো। চর দখলের মতো ক্ষমতার দখল বলবত থাকল। দেশের অবস্থা ‘অন্ধকারের যুগ’কেও হার মানাল। বিভিন্ন ফন্দি এঁটে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন নিতান্ত ডালভাতে রূপ নিল। পার্শ্ববর্তী হিন্দত্ববাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদী নীতির খুঁটোর জোরে তাদের এদেশীয় অনুচর ও গদি দখলকারীরা আনন্দের আতিশয্যে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলো। দেশ পূর্ণমাত্রায় অমাবশ্যায় ঢেকে গেল। নিকষকালো অন্ধকারে ‘হাড়িচাটার দল’ ও পদলোভী-স্বার্থবাদী তোষামোদকারীর দল প্রকাশ্যে লাখ-কোটি টাকা লোপাট ও অর্থপাচার করে কোষাগার শূন্য করে ফেলল। এসব অপকার্যকলাপ আওয়ামীলীগের অনেক সমর্থককেও স্বীকার করতে ও ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখেছি। দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ ও বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের দুর্দমনীয় আন্দোলনে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলনে সাধারণ মানুষের প্রবল বাঁধভাঙা তোড়ে পরগাছা শেখ হাসিনার স্বপ্নের মসনদ

ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ আবার নিল। এ প্রতিশোধ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমতুল্য। পেছনে ফেলে রেখে গেল অগণন গুম-হত্যা, আয়নাঘর, মাত্র দশ দিনে কমপক্ষে দেড় হাজার ছাত্র-যুবকের রক্তমাখা নিথর প্রাণ ও হাসপাতালের বিছানায় শায়িত হাজার হাজার জীবন্মৃত ছাত্র-যুবকের আহাজারি।

সাধারণ মানুষের 'ভয়তরাসে' ভাব এখনো রয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতাদের শুধু নিজের সততা দিয়ে নিজেকে বিচার করলেই হবে না। গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত নেতাদের মধ্যে, প্রতিটা অফিসের বিভিন্ন পদধারীদের মধ্যে এতদিনের লাখ পেরিয়ে কোটি টাকা তৈরির অবৈধ বাসনা পেয়ে বসেছে। সাধারণ মানুষের 'ভয়তরাসে' না হয়ে উপায় কি? 'যে লংকায় যায়, সেই হয় রাবণ'। এখন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। দেখছি, রাজনৈতিক দলগুলোর মাথায় রাষ্ট্র সংস্কারের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সব দলই 'হাঁড়িচাটার দল' সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এ 'ভয়তরাসে' সাধারণ মানুষ অনেক বছর ধরেই তো বাস্তবতা দেখল; দীর্ঘ ১৬টা বছরও দেখল; তারা রাজনীতিকদের ওপর আস্থা রাখবে কোন ভরসায়? শত শত বছর কি এভাবেই কাটবে? তারা এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দেখতে চায়, সরকারি প্রতিটা পদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চায়, রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করতে চায়। যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তাতে তাদের কোনো যায়-আসে না।

যত সময়ই লাগুক, আমূল সংস্কার এজন্যই প্রয়োজন। যদি বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর দেশ গড়ার আন্তরিক ইচ্ছে থাকে, অন্তর্বর্তী সরকারকে সময় দিতে হবে। সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে হবে। দেশে সত্যিকারের উন্নতির জন্য প্রতিটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরাজিত দুর্নীতিমনা নেতাকর্মীদের দল থেকে দূরে রাখতে হবে। তড়িঘড়ি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বেশি উদগ্রীব হলে অতীতের নিষ্ফল সুষ্ঠু নির্বাচনের মতো হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া মানেই উন্নয়নের মগডালে পৌঁছে যাওয়া নয়। এটা উন্নয়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। উন্নয়নের জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর দরকার আছে। মঞ্চে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা আর দেশগড়া এক কথা নয়। কয়েক যুগ পর একবার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ অনেক নিষ্কলুষ জীবন বিসর্জনের পর জাতির জন্য শুভক্ষণ। একে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করে কাজে লাগাতে হবে। রাজনীতিবিদদের পরচর্চা করা বড় অভ্যাস। সরকারকে গঠনমূলক পরামর্শ দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে প্রতিটা বিভাগে যেভাবে সংস্কার করা সম্ভব; কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেভাবে সংস্কার করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বপালনে শৃঙ্খলা ফেরাতে হবে। এজন্য আইনকানুন পরিবর্তনের প্রয়োজন। মৌখিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে সব পর্যায়ে বাস্তবিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা সদিচ্ছার ব্যাপার। সামাজিক শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয়ে তাড়াহুড়া করে সংস্কার করতে বলা মানে সংস্কার না করে তাড়াতাড়ি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাধিষ্ঠিত হওয়ার গোপন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। সংবিধানে যেসব ধারা রয়ে গেছে, এই বিপ্লব ব্যর্থ হলে হাজার হাজার দেশপ্রেমী মানুষ বিপদে পড়ে যেতে পারেন। বিভিন্ন পক্ষের বিপরীতমুখী সমালোচনায় আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনা ক্রমশ দূরে পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশিদের স্বভাবজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব নিকটবর্তী হচ্ছে।

অনেক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের রাজনীতি করার কারণ জানার ঘাটতি আছে। বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যই অধিকাংশ নেতাকর্মী রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়। এ থেকে বের হতে গেলে যে কোনোভাবে নীতিমালা তৈরি করে আগে রাজনীতিতে টাকার খেলা বন্ধ করতে হবে। এমপি কর্তৃক এলাকার উন্নতির নামে টাকার ভাগবাঁটোয়ারা রদ করতে হবে। এতে সুশিক্ষিত মানুষ আদর্শের কারণে জনসেবাকে ধর্মজ্ঞানে রাজনীতিতে আসবেন। বর্তমান রাজনীতি হয়ে গেছে যত দুর্নীতিবাজ ও সোশ্যাল টাউটদের রাজনীতির নামে মিথ্যাচার ও লাঠি-পুঁজির ব্যবসা। সেজন্য সংবিধান পরিবর্তন, অন্যান্য আইনকানুন পরিবর্তন অনেক ভেবেচিন্তে করতে হবে। নিতান্ত নাদান-মূর্খ ছাড়া দেশের উন্নতি কে না চায়! কোনো ঠুনকো অজুহাতে অন্তর্বর্তী

সরকারকে সরানোর বুদ্ধি করা যাবে না। এটা আত্মঘাতী হবে। তারা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার নামে আন্দোলনের চমৎকারিত্ব রাজপথে দেখিয়ে সরকারকে অস্থির করে রাখা হয়েছে, দাবি আদায়ের অজুহাতে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে; পতিত সরকারের কর্মকর্তারা প্রচ্ছন্নভাবে অসহযোগিতা করে চলেছেন। কোষাগারে যে টাকা এসে জমছে, মেগা প্রকল্পের নামে লুটতরাজের জন্য যে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার কিস্তি দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কুঁজোকে চিৎ করে শোয়াতে বললে আগে তার অপারেশনের সময় দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারকে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এতে সরকারের মূল কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। আর তাদের কারো হাতে তো আলাদিনের চেরাগ নেই। চল্লিশ বছর ধরে সবক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা তৈরি হবে আর সমাধান করে দিতে হবে কয়েক মাসের মধ্যে; কীভাবে সম্ভব? অন্তর্বর্তী সরকারে কর্মরত অধিকাংশ উপদেষ্টার দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাদের সমালোচনা করে লাভ নেই। দেশ বাঁচাতে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসুন। তারাই পারবেন। নইলে পরিণামে আম-ছালা দুটোই যাবে। বিভিন্ন সরকারি বাহিনীর কাছে দেশের অস্তিত্ব ও সার্বিক স্বার্থের তুলনায় নিশ্চয়ই দলীয় সমর্থন বড় নয়। আমার বিশ্বাস, সে-বুঝ তাদের আছে।

যাদের ধৈর্য একেবারেই নেই, প্রয়োজনে ধৈর্যের জন্য হোমিও ওষুধ খেতে হবে; তবু ধৈর্য ধরুন। বহিঃশক্তির আগ্রাসনমুক্ত জাতি গঠনে যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, সে সুযোগ দেশের উন্নয়নে সঠিকভাবে ও সর্বোচ্চমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে; তা বিদ্যমান সব রাজনৈতিক দলকে কাজে লাগাতে হবে। দেশে যে সংস্কার করতে হবে, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি নতজানু না হয়ে সাধারণ মানুষ ও দেশের মঙ্গলের দিক লক্ষ্য রেখে করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পর এবারই দেখলাম ছাত্র-জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের প্রয়োজনে অকাতরে প্রাণ দিল। রাজনৈতিক দলগুলো সামনে না এসে তাদের সাহায্য করল। আমি একজন শিক্ষক হওয়াতে খুব কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীদের আবেগ-অনুভূতিকে পর্যবেক্ষণ করেছি। পতিত সরকারের বিরুদ্ধে দেশের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ ও দল-নির্বিশেষে এমন উন্মাদনা মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আর দেখিনি।

খবরে যা শুনলাম, মনে হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের হুঁশ ফিরেছে; তারা বুঝতে পেরেছে কুচক্রী বহিঃশক্তি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তৃতীয় পক্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তেমনটি হলে এদেশ করদ রাজ্যে পরিণত হবে। বিএনপি ও জামায়াতের বুঝতে হবে দলীয় স্বার্থের তুলনায় দেশের স্বার্থ নিশ্চয়ই অনেক বড়। বহিঃশক্তি ছলে-বলে, কলে-কৌশলে তাদের সেবাদাসের সহায়তায় দিনে দিনে দেশটাকে কুক্ষিগত করতে চায়। এটা অতি পরীক্ষিত সত্য, বিধাতা প্রদত্ত সাধারণ বোধশক্তিতেই তা বোঝা যায়। শেখ হাসিনা প্রভুর আশ্রমে বসে মাঝে-মধ্যেই বিষবাষ্প নিসৃত হুংকার ছাড়ছেন। তাদের বংশবতংস ও পোষ্যপুত্রদের চিন্তাচেতনা স্বাধীন দেশবিরোধী; তাদের যুক্তি ও তর্কের শেষ নেই। 'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ও স্বাধীন থাকবো' এই বোধোদয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশিদের দেশাত্ববোধ ও দেশপ্রেমের মাত্রা বাড়াতে হবে। শুধু বিএনপি-জামায়াত কেন, সম্প্রসারণবাদ ও বহিঃশক্তির আধিপত্যবাদ ঠেকাতে সব দেশপ্রেমী দলকে একজোট হতে হবে। দেশ পরিচালনার যথাযথ সিস্টেম উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব পালন শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর 'জাতীয় সরকার'-এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে দূর ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পেঁটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিরা অন্য কোথাও অজানা গন্ত্যব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

(৩ নভেম্বর '২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ